বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি)

আয়োজিত

আলোচনা ও মতবিনিময় সভা

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সমস্যা

১৫ এপ্রিল ২০১৬, ঢাকা

মূল প্রবন্ধ

আমরা এমন এক সময়ে সমবেত হয়েছি, যখন চারদিকে নয়াউদারবাদী উন্নয়নের ঢাক বাজছে আর তার নিনাদে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দেশের কৃষক-শ্রমিক-শ্রমজীবী মানুষের হাহাকার আর বঞ্চনার ইতিহাস। গণমাধ্যম আর 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' পণ্ডিতদের সাজানো সোনালি-রুপালি চোরাবালিতে আটকে যাওয়া শ্রমজীবী মানুষেরা কেবল 'বড়লোক হবার খোয়াব' দেখে চলেছে। রানা প্লাজা, তাজরীন ফ্যাশনসের দুর্ঘটনার মতো ভয়ংকর ঘটনায় কখনো বা সম্বিৎ ফিরছে, কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণের ঘানি 'অসংগঠিত' ও 'পরস্পরের সঙ্গে নিত্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত' শ্রমিকদের আটকে রাখছে আইনি গরাদের বঞ্চনার কারাগারে।

এ দেশের শ্রমিকেরা 'পূর্ণ নাগরিক অধিকার' ভোগ করা তো দূরের কথা, 'মানুষ' হিসেবেও গণ্য হয় না। সর্বত্র তার প্রতি 'করুণার নজর', যেন সে কিছু পাওয়ার অধিকারী নয়, নিজস্ব মত বলতে তার কিছু নেই, নেই কোনো সত্তা। তার কাজ কেবল খেটে যাওয়া; আর সমস্ত কৃতিত্ব তার মালিকের-নিয়োজকের। আর সরকার, অর্থাৎ দেশের প্রশাসন, আদালত, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও বিভিন্ন একাডেমি শ্রমিকদের সঙ্গে মেতেছে এক অলৌকিক তামাশায়। সংবিধান, আইন, ঘোষণায় শ্রমিকদের বহু অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে, মাঝেমধ্যে গরম গলায় হাঁক ছেড়েছে, কিন্তু সেসব বাস্তবায়নের বেলায় সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ। নিরুপায় শ্রমিকেরা নিজেদের ইতিহাস আর মালিকশ্রেণির চরিত্র দেখে এতটুকু শিখেছে যে, সংগ্রাম ছাড়া তার ভিন্ন উপায় নেই। তাই সে বারবার ট্রেড ইউনিয়ন, নিরাপদ কর্মস্থান, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও মজুরির দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে। আজ আমরা মজুরি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ শুধু নয়, একটি যথার্থ কর্মনীতি ও কৌশল স্থিরের প্রচেষ্টাই আজ আমাদের একান্ত কাম্য বিষয়।

সাধারণভাবে একজন শ্রমিক পণ্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য যে শ্রমশক্তিটুকু ব্যয় করে, তার মূল্যকে বলা হয় মজুরি। অন্যভাবে বললে, কাজের জন্য ব্যয় হওয়া শ্রমশক্তি ফিরে পেতে একজন শ্রমিকের টাকার অঙ্কে যে মূল্যের প্রয়োজন হয়, সেটাই একজন মালিক শ্রমিককে দিয়ে থাকে। অর্থাৎ শ্রমিক যাতে পরদিন আবার কাজ করতে পারে, তাই তার ফুরিয়ে যাওয়া শ্রমশক্তি ফিরে পাওয়া দরকার এবং এ বাবদ যে টাকা মালিক শ্রমিককে দেয়, সেটাকেই বলা হয় মজুরি। অথচ হিসেব করলে দেখা যায়, এ মূল্য সৃষ্টির জন্য একজন শ্রমিকের দিনে আট ঘন্টা খাটার প্রয়োজন হয় না। তিন-চার ঘন্টা খেটেই সে এই মূল্য তুলে ফেলতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি আর সামাজিক উৎপাদনশীলতা বাড়লে এই সময়ের পরিমাণ আরও কমে আসে। অথচ শ্রমিককে অনেক বেশি সময় খাটতে হয়। পুঁজিপতি কিন্তু এই বাড়তি সময়টার মূল্য শ্রমিককে দেয় না; রেখে দেয় নিজের কাছে। এটা তার লাভ বা মুনাফা। যা হোক, এই শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যের সমান মূল্যই হওয়া উচিত সর্বনিম্ন মজুরি। ইংরেজিতে একে বলা হয় minimum wage, বাংলায় যা নিম্নতম বা ন্যূনতম মজুরি।

আমাদের দেশে সাধারণত নিয়োজক, শ্রমিক ও সরকারের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটি ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে থাকে। তবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন-মজুরি নির্ধারণ করে সরকারি উদ্যোগে বেতন কমিশন। এ রকম খাতওয়ারি ন্যূনতম মজুরির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- শ্রমের চাহিদা-জোগান, শ্রমিকের খাবার-বাসস্থান-চিকিৎসা-যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ, নিয়োজকের সামর্থ্য, শ্রমিকের দাবি ও সামাজিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়।

- সাধারণত এটি ঘন্টা ধরে হিসেব করা হয়। যেমন : ব্রিটেনে ২১ বছরোর্ধ্ব শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘন্টায় সাড়ে ছয় পাউন্ড। বাংলাদেশে এখনো মাস ধরে মজুরি হিসেব করার পদ্ধতি চালু আছে।
- ন্যূনতম মজুরি হারের কম হারে মজুরি প্রদান করা আইনত নিষিদ্ধ। তবে নিয়োজক চাইলে এর বেশি মজুরি দিতে পারে।
- প্রতিবছর এটি পর্যালোচনা করা হয়।
- কার্যত এটি একটি আইনি ব্যবস্থা, কেবল টাকার অঙ্ক নয়। নিয়োজকেরা শ্রমিকদের মজুরির পাশাপাশি মানবাধিকারের মতো অন্যান্য অধিকার দিতেও বাধ্য হয়।

আসলে মজুরি ব্যবস্থাকে যতটা সহজ-সরল বলে মনে হয়, বিষয়টি তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। এটি কেবল শ্রম বা শ্রমঘন্টার বিনিময় মূল্য নয়। এটি বহু মানুষের আয়-কর্মসংস্থান-জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। তবে এর সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। এ ছাড়া মজুরির সঙ্গে বোনাস, ভাতা, ওভারটাইম, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, স্বাস্থ্যবিমা, পারিবারিক নিরাপত্তা, দরকষাকষির অধিকার, মাতৃত্ব-পিতৃত্বকালীন ছুটি, নৈশ দায়িত্ব পালন, অবসর বয়সসীমা, অর্থনৈতিক বিকাশ, নিয়োজকদের মজুরি প্রদানের সক্ষমতা, মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ভোগ্যপণের দাম, শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ও জড়িত। তাই মজুরি বিষয়ে কোনো সরল আলোচনা নয়, বরং পর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়ে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে একটি কর্মকৌশল নির্ধারণ বা ব্যবস্থা দাঁড় করানো দরকার।

মজুরির আলোচনার কেন্দ্রে ‘জাতীয় ন্যূনতম মজুরির’ প্রশ্নটি এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, তা দেশের শ্রমিকদের ‘সাধারণ ন্যূনতম জীবনমান’ নিশ্চিতের জন্য জরুরি। খাতওয়ারি বা অঞ্চলভিত্তিক নির্ধারিত মজুরি যেমন শ্রমিকদের ‘ন্যূনতম জীবনমান’ নিশ্চিত করে না, তেমনি দারিদ্র্য দূর, বৈষম্য নির্মূল বা সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও খুব কার্যকর প্রভাব রাখতে পারে না।

এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি কাঠামো বা বেতন স্কেল প্রণয়ন না করে সব শ্রমিকের জন্য অভিন্ন মজুরি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বিশ্বজুড়ে এ ব্যবস্থা ‘জাতীয় ন্যূনতম মজুরি’ হিসেব পরিচিত। এটিকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় মজুরিও বলা হয়। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত না হলে, জাতীয় ন্যূনতম জীবনমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা একটি আইনি প্রক্রিয়া, যা নিয়োজকেরা মেনে চলতে বাধ্য থাকে। কার্যত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আইনি ভিত্তি, তা-ই একে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
- একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণ করে এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের চাহিদা হিসেব করে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঠিক করা হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার তালিকা প্রণয়ন করতে এবং প্রতিবছর সেগুলোর মূল্য হিসেব করার জন্য এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষ থাকে।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে খেয়াল রাখা হয়, যাতে তা মজুরদের দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়।
- এই মজুরি শ্রমিকদের সচ্ছলতার নিশ্চয়তা দেয় না, কেবল বাঁচিয়ে রাখার জন্য ন্যূনতম উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শ্রমিকদের সচ্ছল জীবনযাপন নিশ্চিতের জন্য আরেক ধরনের মজুরির দাবি অনেক দিনের। ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশনসহ বিভিন্ন শ্রমিকবান্ধব সংগঠন বহুদিন ধরে এ ধরনের মজুরি দাবি করে আসছে। সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাঁচার মতো মজুরি বা লিভিং ওয়েজের দাবি বেশে জোরের সঙ্গে উঠে এসেছে।

কেবল প্রাণধারণ নয়, শ্রমিকদের বিকাশ, বিনোদন ও সম্ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য, সেবা ও চাহিদার মূল্য হিসাব করে বাঁচার মতো মজুরি বা জীবনধারণ মজুরি (Living Wage) নির্ধারণ করা হয়।

বাসস্থান, সন্তানাদি পালন, চিকিৎসা, যাতায়াত, স্বাস্থ্যসেবা, কর-মূসক এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা—এই সাতটি নিয়ামক হিসেব করে ন্যূনতম জীবনধারণ মজুরি নির্ধারণ করা হয়। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- এটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি হয়
- দারিদ্র্যসীমা নয়, বরং শ্রমিকের চাহিদা হিসাব করে জীবনধারণ মজুরি নির্ধারিত হয়
- সংসার নির্বাহ ও সন্তানাদি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় খরচকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়
- জীবনযাপনের ধরন, অবস্থান, কর ব্যবস্থা ইত্যাদি ভেদে জীবনধারণ মজুরিও হয় ভিন্ন ভিন্ন

তবে বাঁচার মতো মজুরি বা জীবনযাপন মজুরি অনেক দিনের দাবি হলেও আজো তা পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ধরে দিতে হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে, যেখানে শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত বহু ধরনের বৈষম্য, প্রতারণা, শোষণ ও বঞ্চণার মধ্য দিয়ে কোনোমতে প্রাণ ধারণ করছে, সেখানে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নই এক বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা :

১৯৫৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রথম The Minimum Wages Act 1957 জারি করে। পরে ১৯৬১ সালে Minimum Wages Ordinance 1961 (আগের আইনটি বিলুপ্ত করে) জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশের আওতায় সেবামূলক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য গঠিত হয় এক নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এরপর ১৯৭৩ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য মজুরি ও প্রান্তিক সুবিধা নির্ধারণ/সংশোধনকল্পে সরকার সময় সময় মজুরি কমিশন গঠন করে এবং তখন পর্যন্ত মোট চারটি মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে। এগুলো ২৪টি শিল্প খাত বা উপখাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করেছে।

১৯৬৯ সালে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের মুখে তৎকালীন ডেপুটি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মালিক নূর খান ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মালিকপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দফা বৈঠকের পর পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স অর্ডিন্যান্স বা শিল্পসম্পর্ক অধ্যাদেশ জারি করেন। এ শ্রম কমিশন নূর খান কমিশন নামে পরিচিতি পায়। এতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৫৫ টাকা (এর মধ্যে ১২৫ টাকা মূল মজুরি এবং ৩০ টাকা প্রান্তিক সুবিধা) নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১৯৯১ সালে গঠিত হয় জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, যা ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় নিম্নতম মজুরি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয় : নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ও সমন্বয় করার বিভিন্ন নির্ণায়ক রহিয়াছে। কমিশন মোট ছয়টি নির্ণায়কের ভিত্তিতে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ও উহার সমন্বয়ের বিষয়টি বিবেচনা করিয়াছে। এইগুলি হইল : (১) শ্রমিকদের ন্যূনতম চাহিদা, (২) সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে মালিকদের মজুরি পরিশোধ করার ক্ষমতা, (৩) শিল্প শ্রমিকদের জীবনধারণ পদ্ধতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য শ্রমিক গোষ্ঠীর তুলনামূলক মজুরি, (৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্তাদি, (৫) শ্রমিকের সরবরাহ ও চাহিদা এবং (৬) শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি সংরক্ষণ। বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ করে সেখানে সরকারি কর্মচারীদের নিম্নতম ৯০০ টাকা মজুরি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

সর্বশেষ ২০০১ সালের জুলাই মাসে একটি জাতীয়ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি কাঠামো ঘোষণা করেছিল সরকার। তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ১,২০০ টাকা এবং বড় শিল্পের শ্রমিকদের জন্য ১,৩৫০ টাকা মাসিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এর বিরোধিতা করে মালিকদের সর্বোচ্চ সংগঠন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

নির্ধারণে পদ্ধতিগত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় উচ্চ আদালত এ-সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা স্থগিত ঘোষণা করে। পরে সরকারের দিক থেকেও এ বিষয়ে তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি।

২০০৬ সালে শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প-সম্পর্কিত আগের সব আইন বাতিল করে এক নতুন আইন জারি করা হয়। এ আইনের অধীনে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ড এখন পর্যন্ত মোট ৪২টি শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করেছে। অথচ দেশে পেশার ধরন কয়েক হাজার। এ ছাড়া এটাও লক্ষণীয় যে, প্রতিটি মজুরি বোর্ড গঠিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনের চাপে। তার পরও এসব বোর্ড যে মজুরির সুপারিশ করেছে, তা অধিকাংশ সময় শ্রমিকদের দাবির অর্ধেকেরও কম।

বিভিন্ন শ্রম ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, শ্রম ইনস্টিটিউট এবং শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মজুরির হিসেব দিয়েছে। দেখা গেছে, ঘোষিত মজুরির সেসব হিসেবের তুলনায় অনেক কম। তাহলে এত কম মজুরি পেয়ে শ্রমিকেরা বেঁচে থাকে কীভাবে? কীভাবে তাদের শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন ঘটে? কার্যত এই স্বল্প মজুরিতে কায়িক শ্রমিকেরা তাদের খরচ হওয়া শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন করতে পারে না। এসব শ্রমিক কম খেয়ে, কম পরে, সন্তানাদি ও মা-বাবাকে বঞ্চিত করে কারখানা বা নিয়োজকের জন্য খাটে। তাই ঘাটতি থেকেই যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুষ্টির অভাবজনিত বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। আবার শহরের শ্রমিক এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বেশির ভাগ শ্রমিক গ্রামের বাড়ি থেকে চাল, মুড়ি, চিড়া, আলু, ফল, মসলা ইত্যাদি এনে নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করে। এসব খাবার তাদের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের কাজে লাগে। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে, তারা ঘরের টাকা দিয়ে কারখানা চালায়।

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের মজুরি আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা :
(১) 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরির' দাবিটি উপেক্ষিত থেকে গেছে। প্রায় সব জাতীয় ফেডারেশন এবং কখনো কখনো কোনো কোনো রাজনৈতিক দল দাবিটি তুলেছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নে লাগাতার ও দেশজোড়া কোনো আন্দোলন বা সামাজিক প্রচার-প্রচারণা দৃশ্যমান নয়।

(২) মজুরির আন্দোলন এখনো খাতওয়ারি ন্যূনতম মজুরির দাবিতে সীমাবদ্ধ। এখন পর্যন্ত জাতীয় নিম্নতম মজুরি বোর্ড ৪২টি খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। এসব মজুরি ত্রিপক্ষীয়—অর্থাৎ মালিকপক্ষ, শ্রমিকপক্ষ ও সরকারপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ নিয়োজকেরা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিতে ব্যর্থ বা অস্বীকৃত হলে সেটি অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। শাস্তি বা জবাবদিহির প্রক্রিয়া না থাকায়, অধিকাংশ নিয়োজক শ্রমিকদের ঠকিয়ে শোষণ জারি রাখার সুযোগ পেয়ে যায়।

(৩) মজুরির দাবি সব শ্রমিকের এবং এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু তার পরও মজুরির আন্দোলন বিচ্ছিন্নতা, অবিশ্বাস, দলীয় সংকীর্ণতা, এনজিওবাজি ও সংঘাতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। দল-মত নির্বিশেষে এক দাবিতে একীভূত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি।

(৪) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে বিভিন্ন মানদণ্ড/ নির্ণায়ক নিয়ে জটিলতা আছে। কীভাবে, কিসের ভিত্তিতে হবে এ হিসেব? শ্রমিক পরিবারের আকার কতটুকু হবে, খাবার বা ভোগ্যপণ্য কী পরিমাণ প্রয়োজন হবে, তা কে নির্ধারণ করে দেবে? বাসাভাড়া, যাতায়াত, কর-মূসক দেওয়া, ফোন বিল, পানি বিল, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির খরচ ন্যূনতম মজুরির অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, তাও বিবেচনা করা জরুরি।

(৫) নিম্নতম মজুরি বোর্ড যে মজুরি নির্ধারণ করে, তা ঠিক কত বছর পর পর এবং কীভাবে পুনর্নির্ধারিত হবে, তা এখনো নির্দিষ্ট নয়।

মজুরি নির্ধারণে দার্শনিক সমস্যা :
মজুরি আন্দোলনের বা মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য কেবল একটি অঙ্ক—যেমন : পাঁচ হাজার বা দশ হাজার টাকা নির্ধারণ করা নয়। বরং এর পেছনে কার্যকর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক দর্শনকে প্রশ্ন করাও এর এক উদ্দেশ্য।

একজন ঝাড়ুদারের কাজকে সমাজ একজন শিক্ষকের কাজের তুলনায় অগুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে বলেই ঝাড়ুদারের মজুরি হয় শিক্ষকের চেয়ে কম। আবার শিল্পকারখানার পণ্য বিক্রি করে দৃশ্যমান অর্থ রোজগার হয় বলে, সমাজে একজন কৃষি শ্রমিকের চেয়ে একজন মেকানিক বা প্রযুক্তিবিদের বেতন বেশি হয়।

এর বাইরেও আছে বহু ধরনের বৈষম্য। প্রতিটি শিশুর সমান শিক্ষার সুযোগ [সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত], প্রত্যেক মানুষের সমান চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ [সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত] এবং 'মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি' [সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ] দিতে হলে ধনী-সচ্ছল নির্বিশেষে সব পরিবারে সন্তান পালনে ন্যূনতম একই পরিমাণ ব্যয় হওয়ার কথা। সে হিসেবে মজুরির তীব্র বৈষম্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি পাস হওয়া সরকারি কর্মচারীদের চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫-তে সর্বোচ্চ বেতন নির্ধারিত হয়েছে ৭৮ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন আট হাজার ২৫০ টাকা। এ ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট ও দৃশ্যমান।

প্রায়োগিক সমস্যা
(১) আইনি কাঠামোর অনুপস্থিতি: জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা চালু করতে হলে এর জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রয়োজন, অথচ বাংলাদেশে তা নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর [যা ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩-তে সংশোধিত হয়] ১৩৮ ধারায় নিম্নতম মজুরি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকদের জন্য পৃথকভাবে মজুরি নির্ধারণের সুযোগ রাখা হয়েছে। আইনের একাদশ অধ্যায়ের অধীন ১৩৮ ধারা থেকে শুরু করে ১৪৯ ধারা পর্যন্ত মোট ১২টি ধারায় কোথাও জাতীয় নিম্নতম মজুরি প্রদানের সুযোগ রাখা হয়নি। ১৪৯ ধারায় বলা হয়েছে 'নিম্নতম মজুরি হারের চেয়ে কম হারে মজুরি প্রদান নিষিদ্ধ,' অথচ এ নিয়ম অমান্য করলে কি হবে, তার ব্যাখ্যা আইনটিতে যেমন নেই, তেমনি আইনের যে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, তাতেও উল্লেখ করা হয়নি।

(২) ঘণ্টা ধরে মজুরি হিসেব না করে মাসওয়ারি মজুরি নির্ধারণে জটিলতা: এতদিন যেভাবে মজুরি নির্ধারিত হয়েছে বা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে বড় জটিলতা সৃষ্টি করেছে মাস ধরে মজুরি হিসেবের পদ্ধতি। এর দুটি খারাপ প্রভাব আছে: প্রথমত এটি অনেকক্ষেত্রে শ্রমশোষণের সুযোগকে অবারিত করেছে, দ্বিতীয়ত, কৃষিশ্রমিক, গৃহশ্রমিক, দিনমজুরের মতো শ্রমিকদের নিয়োজকদের মধ্যে এক ধরনের ত্রাস ছড়িয়েছে। ফলে, এসব নিয়োজক 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার' ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠেছে।

এদেশে অনেক পেশা আছে, যেগুলোর কর্মঘণ্টা আজো নির্দিষ্ট নয়, যেমন: কৃষি শ্রমিক, দোকানি, গৃহশ্রমিক ইত্যাদি। আবার অনেকগুলোর কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকলেও বেশিরভাগ দিনে বেশি সময় কাজ করতে হয়, অথচ তার জন্য ওভারটাইম মেলে না। যেমন: সাংবাদিক, স্কুলশিক্ষক ইত্যাদি। এই বৈষম্য দূর করার জন্যই বিশ্বজুড়ে ঘণ্টাওয়ারি মজুরি হিসেবের পদ্ধতি সর্বত্র স্বীকৃত।

আবার, কৃষিমজুরদের মাসিক জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১২,০০০/-টাকা নির্ধারণ করা হলে, অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে তা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ ঘণ্টা প্রতি মজুরি ৫০ টাকা নির্ধারিত হলে চাষী তার মজুরকে দিনে আট ঘণ্টা কাজ করার জন্য ৪০০ টাকা মজুরি দেবেন। যদি মাসে ১০ দিন মজুরিকে কাজে নিতে হয়, তবে মজুরি দিতে হবে চার হাজার টাকা। যা ভরা মৌসুমে একজন চাষী অহরহই মজুরকে দিয়ে থাকেন। অথচ ১০ দিনের জন্য পুরো মাসের মজুরি অর্থাৎ ১২ হাজার টাকা দিতে হলে, চাষী ফতুর তো হবেনই, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়ে নেবেন।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের বিরুদ্ধে নিয়োজকদের যুক্তির জবাব

দৈনিক প্রথম আলোতে ১৮ মে ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত 'দেশে কোনো জাতীয়ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নেই' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) যুক্তি উঠে এসেছে। বিইএফের তৎকালীন সভাপতি ফজলুল হক জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থার বিরোধিতা করে খাতওয়ারি মজুরি নির্ধারণ ব্যবস্থার পক্ষে প্রথম আলোকে বলেন, 'শিল্প খাতের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিচার করে খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরিই যুক্তিযুক্ত। একটি শ্রমঘন শিল্পে যে ধরনের ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন হবে, একটি পুঁজিঘন শিল্পে সে ধরনের ন্যূনতম মজুরির প্রয়োজন হবে না।'

ফজলুল হক আরও বলেন, 'একটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হলে একাধিক সমস্যা দেখা দেবে। প্রথমত, দেশের বিরাট অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্যও এই ন্যূনতম মজুরি প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা দেখা দেবে। অথচ অনানুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের সেই সুযোগ ও সামর্থ্য নেই। দ্বিতীয়ত, উঁচু হারে মজুরি দিতে সক্ষম ও দেওয়া প্রয়োজন এমন অনেক শিল্প খাতও জাতীয় ন্যূনতম মজুরির দোহাই দিয়ে শ্রমিকদের কম মজুরি দেবে। এতে শ্রমিকেরা বঞ্চিত হবে।'

'বিইএফের সভাপতি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ওষুধ শিল্পের শ্রম মজুরি আর হোসিয়ারি শিল্পের মজুরি নিশ্চয়ই একই ধরনের হতে পারে না। ন্যূনতম মজুরিতেই সেখানে পার্থক্য হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে খাতভিত্তিক মজুরি ওই খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার আলোকে নির্ধারণ করার সুযোগ থাকে। সবকিছু বিবেচনায় জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কতটা বাস্তবসম্মত, তা ভেবে দেখা দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি।'

দৈনিক প্রথম আলোতে ১৪ মে ২০১৪ সালে প্রকাশিত 'ন্যূনতম জাতীয় মজুরি অনিশ্চিত' শিরোনামের আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেটিতেও আরেক যুক্তি দেখান নিয়োজকেরা। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সাবেক সভাপতি ফজলুল হকের মতে, একটি জাতীয়ভিত্তিক নিম্নতম মজুরি একদিকে দেশের বিরাট অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য মজুরি প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করবে। অথচ অনানুষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের সেই সক্ষমতা নেই। অন্যদিকে, অধিক হারে মজুরি দিতে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিল্প খাত জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অজুহাত তুলে শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে চাইবে, যা আবার শ্রম অসন্তোষ তৈরি করতে পারে।

তৈরি পোশাক বা ওষুধ শিল্পের শ্রম মজুরি আর দেশলাই কারখানার বা হোসিয়ারি শিল্পের ন্যূনতম মজুরি একই ধরনের হতে পারে না উল্লেখ করে ফজলুল হক বলেন, 'আসলে খাতভিত্তিক মজুরি সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার আলোকে নির্ধারণ করার সুযোগ থাকে।'

বলা হচ্ছে, খাতওয়ারি মজুরি নির্ধারণে খেয়াল রাখা হয়, কোন খাত কতটুকু পুঁজিঘন ও শ্রমঘন। 'একটি শ্রমঘন শিল্পে যে ধরনের ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন হবে, একটি পুঁজিঘন শিল্পে সে ধরনের ন্যূনতম মজুরি প্রয়োজন হবে না।' এ ক্ষেত্রে কেবল দুটি কথা বলাই যথেষ্ট। প্রথমত, ন্যূনতম মজুরি পারিশ্রমিকের সর্বনিম্ন সীমা, সর্বোচ্চ নয়। নিয়োজকেরা চাইলেই শ্রমঘন শিল্পের শ্রমিকদের পুঁজিঘন শিল্পের শ্রমিকদের চেয়ে বেশি বেতন দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের মজুরি 'যথাসাধ্য কমিয়ে রাখার' যে নীতি নিয়োজকেরা মেনে চলেন, তার অর্থ এই নয় যে, শ্রমিকদের অতি দরিদ্র বা হতদরিদ্র অবস্থায় রাখতে হবে এবং তাদের কখনোই সচ্ছল জীবনযাপন করতে দেওয়া যাবে না। শ্রমিকদের আরও একটু ভালো অবস্থায় রাখতে মালিকদের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

আর জাতীয় নিম্নতম মজুরি থাকলে তা অন্য কোনো খাতওয়ারি মজুরির সঙ্গে সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করবে, এ চিন্তা অবান্তর। কারণ, বিভিন্ন খাত তার সামর্থ্য ও কাজের ধরন অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করে। এমনকি একই খাতের দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরিতে তফাৎ হয়ে থাকে। কিন্তু জাতীয় ন্যূনতম

মজুরি হলো মজুরির সর্বনিম্ন সীমা, যা নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সব খাতের শ্রমিকদের এক ধরনের আর্থিক সুরক্ষা এবং নিম্নতম জীবনমানের নিশ্চয়তা দেয়।

বিশ্ব অভিজ্ঞতা :

বিশ্ব শ্রম সংস্থার (আইএলও) ১৮৭ সদস্য রাষ্ট্রের প্রায় সবকটিতেই ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা চালু আছে। তবে জাতীয় নিম্নতম মজুরি ব্যবস্থা এখনো সব রাষ্ট্রে চালু হয়নি। গত ১০ বছরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, চীন, জাপানসহ বহু রাষ্ট্রে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি চালু হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত। মিয়ানমার ও নেপালে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা চালু আছে। শ্রীলঙ্কায় তিনটি খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) জন্য দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ ধরনের শ্রমিকদের জন্য পৃথক নিম্নতম মজুরির ব্যবস্থা চালু আছে।

আইএলও-র Conditions of Works and Empoyment ফ্রাঁসোয়া ইউরড (Francois Eyraud) ও ক্যাথরিন সাগেট (Catherine Saget) তাঁদের লেখা The Fundamentals of Minimum Wage Fixing (2005) বইয়ে আইএলও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মজুরি ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তাঁরা দেখিয়েছেন, ২০০৫ সাল পর্যন্ত মোট ৬৮টি রাষ্ট্রে সরকার ও ইউনিয়নদের উদ্যোগে জাতীয় বা প্রাদেশিক নিম্নতম মজুরি চালু করেছে। মোট আটটি নির্ণায়ক বা নিয়মকের ওপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয় নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো : (১) তুলনামূলক মজুরি, (২) সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা, (৩) শ্রমিক ও পরিবারবর্গের ন্যূনতম চাহিদা, (৪) মুদ্রাস্ফীতি, (৫) শ্রমিকের সরবরাহ ও চাহিদা, (৬) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও উন্নয়ন, (৭) উৎপাদনশীলতা এবং (৮) নিয়োজকদের মজুরি পরিশোধের ক্ষমতা। তবে সব রাষ্ট্র সব নির্ণায়ককে গ্রহণ করেনি। অনেকেই দুই বা তিনটি নির্ণায়ক নিয়ে কাজ করেছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : মাত্র ৩ শতাংশ রাষ্ট্রের সরকারের অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ ছাড়া মালিক ও শ্রমিকপক্ষের লোকদের মধ্যস্থতায় জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় মজুরি পরিষদের মাধ্যমে যেসব রাষ্ট্রে মজুরি নির্ধারিত হয়েছে, সেখানে সামাজিক সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এমআইটির জীবনযাপন মজুরির হিসাব :

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অর্থনৈতিক ভূগোল ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক অ্যামি কে. গ্লাসমেয়ার ২০০৪ সালে একটি মজুরি নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করেন। এর নাম দেওয়া হয় : জীবনযাপন মজুরি পরিমাপক বা Living Wage Calculator। বাজারদর অনুযায়ী, একটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম খাবার, শিশুপালন, স্বাস্থ্যসেবা, বাসাভাড়া, যাতায়াতসহ অন্যান্য প্রান্তিক প্রয়োজনের (যেমন : পোশাক, প্রসাধনী, ফোন ইত্যাদি) জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন, তা এই প্রকল্পের মাধ্যমে হিসেব করা হয়। একটি একটি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটভিত্তিক ব্যবস্থা, যা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদা করে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি হিসেব করে থাকে।

সংক্ষেপে হিসাবটি এ রকম :

মৌলিক চাহিদা বাবদ বাজেট = খাবার খরচ + সন্তান পালন ব্যয় + (ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম + স্বাস্থ্যসেবা) + বাসাভাড়া + পরিবহন ব্যয় + অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

জীবনযাপন মজুরি নির্ধারণে মৌলিক চাহিদার ওপরে আরোপিত কর হিসেব করলে দাঁড়ায় :
জীবনযাপন মজুরি = মৌলিক চাহিদা বাবদ বাজেট + {মৌলিক চাহিদা বাবদ বাজেট * (সব ধরনের কর)}

এ ক্ষেত্রে, খাবারের খরচ হিসাব করা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের 'সস্তা খাবার পরিকল্পনা' থেকে। শিশু পালনের খরচের তথ্য নেওয়া হয়েছে National Association of Child Care Resource and Referral Agencies (NACCRRA)-এর দরিদ্র পরিবারের শিশুপালন ব্যয় তালিকা থেকে। স্বাস্থ্যসেবা বাবদ খরচের হিসেব করা হয়েছে—(১) পারিবারিক স্বাস্থ্যবিমা, (২) গড় চিকিৎসা ব্যয়, (৩) ওষুধের দাম, (৪) ওষুধের সরবরাহের খরচ ধরে। বাসাভাড়ার হিসেব এসেছে Department of Housing and Urban Development-এর Fair Market Rents (FMR) বা স্বস্তা বাড়িভাড়ার বিধি থেকে। পরিবহন খরচের টোকা হয়েছে Bureau of Labour Statistics-এর Consumer Expenditure Survey থেকে। এতে কার ও ট্রাকের ভাড়া, জ্বালানি খরচ, অন্যান্য পরিবহনের ভাড়া এবং গণপরিবহনের ভাড়া হিসেব করা হয়েছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাবদ ব্যয়ের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পোশাক, বাসার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রসাধনী, পড়াশোনা ইত্যাদির খরচ। করের খাতে ধরা হয়েছে কেবল আয়করকে।

পর্যালোচনা :

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা কেবল অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য তাই নয়, একটি মানবিক-দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠনের জন্যও একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রমিকেরা পর্যাপ্ত মজুরি পেলে নিজেদের ও সন্তানদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারবে। তাতে বাড়বে উৎপাদনশীলতা, বিকাশ হবে জাতীয় অর্থনীতির। বৈষম্যপূর্ণ মজুরি ব্যবস্থা নারী ও শিশু শ্রমিকদের যেভাবে বঞ্চিত করছে, তার বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হতে পারে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা।

বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৬৬ লাখ এবং হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৭.৬ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় দুই কোটি ৭৬ লাখ। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি জনসংখ্যার বাকিদের ওপরে হয়তো তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না, কিন্তু এই ব্যবস্থা হতদরিদ্র মানুষদের একটি সম্মানজনক জীবনের সুযোগ দেবে।

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সমস্যা হলো এর জন্য নির্ণায়ক বা নিয়ামক নির্ধারণ করা এবং সেসবকে যথাযথভাবে বিচার করা। শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের জন্য বা সুস্থ-সবলভাবে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকের যে অর্থের প্রয়োজন হয়, সেটি হিসেব করারও একটি স্থায়ী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তাও বিবেচনা করা দরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মজুরি নির্ধারণের তৎপরতা পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি, জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সরকারের সদিচ্ছা, ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলোর চাপ, সামাজিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। অথচ এ দেশে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির জন্য যূথবদ্ধ আন্দোলনের কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব শ্রমিক আন্দোলনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে রাখার ক্ষেত্রে খুবই খারাপভাবে কার্যকর রয়েছে। এই সংকীর্ণতা ও পলায়নপর মানসিকতাকে উৎরাতে না পারলে মজুরির আন্দোলন তো বটেই, পুরো শ্রমিক আন্দোলনই ভেস্তে যেতে বাধ্য।

সুতরাং কিছু প্রশ্ন গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হওয়া দরকার। যেমন :

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের নির্ণায়কগুলো কী কী?
- নির্ণায়ক পরিমাপের পদ্ধতি কেমন হবে?
- প্রয়োজনীয় তথ্য বা পরিসংখ্যান কোত্থেকে আসবে?
- মজুরি আন্দোলনকে সহায়তার জন্য প্রচার, গবেষণা, পরিসংখ্যান, প্রযুক্তি, প্রকাশনা ইত্যাদি কীভাবে তৈরি হবে?
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরির দাবিতে যূথবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন কি সম্ভব?
- সমন্বিত ও যূথবদ্ধ কাজের ধরন বা রূপরেখা কী হবে?

বাংলাদেশ শ্রম ইনস্টিটিউট (বাশি) আয়োজিত আজকের সভায় এমন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাঁরা মজুরি নির্ধারণের বিষয়টিতে দীর্ঘদিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। উপস্থিত সবার অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় ন্যূনতম ব্যবস্থা প্রণয়নে করণীয় স্থির করতে পারব, এটাই প্রত্যাশা। সবাইকে ধন্যবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি :

Candland, Christopher. Labor, Democratization and Development in India and Pakistan. London: Routledge, 2007. Print.

Eyraud, Francois, and Catherine Saget. The Fundamentals of Minimum Wage Fixing. 2005 ed. Geneva: International Labour Office. Print.

Liu, Eva, and Jackie Wu. Minimum Wage Systems. Hong Kong: Research and Library Services Division, Legislative Council Secretariat, 1999. Web.

জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের প্রতিবেদন ১৯৯২. ঢাকা : জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ১৯৯২.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

খান, মোহাম্মদ আলী, ড. শ্রমকল্যাণ, শিল্পসম্পর্ক ও শ্রমিক আন্দোলন. তৃতীয় সংস্করণ. ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০১৩. ছাপা.